আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ

বাঙালির স্বরূপ

বাংলার সংস্কৃতির মিশ্র চরিত্রটাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না

০৬.০৯.২০১৯

সমন্বয়: শিবমন্দিরের চূড়ায় ইসলামি-শৈলীর গম্বুজ। জল্পেশ, জলপাইগুড়ি

অনেক বঙ্গবাসীর কাছেই বাঙালি পরিচিতিটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঙালি হওয়ার মধ্যে বিশেষ এমন কী আছে? আর যদি থাকেও বা, সেটা কেন এবং কী ভাবে আমাদের মনোযোগ দাবি করে? এমনকি আনুগত্যও দাবি করে? উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে তার আগে পরিচিতির ধারণা বিষয়ে দু'একটা কথা।

বিশেষ একটা গোষ্ঠীর অংশ হওয়া বা নিজের লোকের প্রতি টান থাকাটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক আত্মপরিচয় নির্ধারণের বিষয়টি আমরা নিকটজন বলতে কাদের বুঝছি, সেই বোধের সঙ্গে

সম্পর্কিত। আমাদের কাছে বাইরের লোকেদের পরিচিতি কী হবে, তা আমরা অনেকটাই হয়তো স্থির করতে পারি তাঁরা কোন পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আসছেন এবং কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, তা-ই দিয়ে। তাঁদের কাছ থেকে আমরা কী ধরনের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আচরণ আশা করি সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রেও তাঁদের এই ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতিগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষকে আলাদা আলাদা বর্গে ভাগ করা এবং তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তা সত্ত্বেও আমরা যাকে নিজেদের পরিচিতি বলে নির্দিষ্ট করছি— এবং অন্যদের যে পরিচিতি নির্ধারণ করছি— সেগুলোর তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। পরিচিতির ধারণা একটা আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে। ফলে, তাকে যতটুকু জায়গা দিলে একটা যুক্তিযুক্ত মানে দাঁড়ায়, প্রায়শই তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমাদের সকলের মধ্যেই নানা রকম পরিচিতি সহাবস্থান করে। আমরা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে নানা গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারি। মনে করা যেতেই পারে যে, আমাদের প্রত্যেকের বহুবিধ পরিচিতি আছে। লোকেদের আলাদা করার বিভিন্ন প্রকরণ আছে। একই লোক একই সঙ্গে এক জন তামিল, এক জন পারাইয়ার, মহিলা, নারীবাদী, নিরামিষাশী, ঔপন্যাসিক, পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যাজ় সঙ্গীতের ভক্ত এবং কলকাতাবাসী হতে পারেন। এখন, জ্যাজ় সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর জ্যাজ় সঙ্গীতপ্রেমী পরিচিতিটা কলকাতাবাসী পরিচিতির চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। কিন্তু তিনি যখন কলকাতার গণ-পরিবহণ নিয়ে সমালোচনা করছেন তখন তাঁর কলকাতাবাসী পরিচিতিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই যে একই লোকের বিভিন্ন পরিচিতি, তাঁদের মধ্যে কোনও একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও একটা পরিচিতিটাকে তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে বেছে নেওয়ার অবকাশ সব সময়েই থাকে।

আবার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে সমাজে কোন অবস্থানে রাখছেন, পরিচিতি বেছে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বেশ জটিল প্রশ্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের গোরা। উপন্যাসের এই প্রতিভাবান নায়কের চরিত্রটি বেশ জটিল। কট্টর রকমের রক্ষণশীল গোরা হিন্দু আচার ও প্রথাগুলোর প্রবল সমর্থক। কিন্তু তার পালিকা মা যখন তার জন্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে, সে আসলে তাঁর নিজের সন্তান নয়, তার আসল মা-বাবা ছিলেন আইরিশ, তখন সে বেশ একটা বিভ্রমের শিকার হয়। সে তো এই সত্য না জেনে, এবং সাহেবদের মতো গায়ের রং সত্ত্বেও, ভারতীয় হিসেবে বড় হয়েছে, এবং হিন্দু রক্ষণশীলদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে সনাতন প্রথাগুলোর উগ্র প্রচারক হয়ে উঠেছে।

আমরা নিজেদের সম্পর্কে নানা জিনিস আবিষ্কার করি, সেগুলো সব সময় গোরার প্রশ্নের মতো মৌলিক না হলেও। গোরার সমস্যাটা হল, তার কাছে কোন সত্তাটা গুরুত্ব পাবে? যাকে বেছে নিয়ে সে

বড় হয়েছে সেই ঐতিহ্য-অনুগত পরিচিতি, না কি জাতিসত্তা, শ্রেণি, এবং অবশ্যই জন্মগত আইরিশ পরিচয়? তাকে ঠিক করতে হল সে তার বিদেশি জন্মসূত্র জেনেও (যে সূত্রে বহু হিন্দু মন্দিরে তার প্রবেশাধিকার থাকবে না) হিন্দু রক্ষণশীলতার ধ্বজা বহন করে নিয়েই চলবে, না কি নিজেকে অন্য ভাবে চিনবে? উপন্যাসে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, জাতি বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরে গিয়ে সে কেবল এক জন ভারতীয় হিসেবেই নিজের পরিচয় দেবে। সুতরাং, নতুন কোনও পরিচিতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও কোন পরিচিতিটাকে গুরুত্ব দেব সেটা বেছে নেওয়ার প্রশ্নটা থেকেই যায়।

২

কোনও একটা পরিচিতিকে গ্রহণ করা মানেই অন্য সবগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেকে বিশেষ কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরিচিতির খোপে ঢুকিয়ে রাখতে হবে, এমন নয়। সেই সম্ভাবনাটাকেও বিবেচনায় রাখতে হতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেটাই অবধারিত হতে পারে না। কী জানতে চাই, সেই অনুযায়ী প্রশ্নগুলো ঠিক করতে হয়। কোনও ব্যক্তির যে সাংস্কৃতিক পরিচিতি নির্ধারণ করা হয় তা এই প্রশ্ন ঠিক করার ব্যাপারে জোরদার আলোকপাত করতে পারে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো নানা ভাবে গড়ে উঠেছে। এই গড়ে ওঠার ইতিহাস, অতীতের সেই সব বৈশিষ্ট্য অনেক

ক্ষেত্রেই গুরুতর— অন্ততপক্ষে ইঙ্গিতবাহী— পার্থক্য গড়ে দেয়।

নিজেকে বা অন্যদের জানবার প্রক্রিয়াটাকে একটা সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক খোপে আটকে রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার মানে আবার এই নয় যে, আমরা যে সাংস্কৃতিক পরিচিতিটাকে বেছে নিচ্ছি তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। বাঙালি পরিচিতিটা নিশ্চয়ই খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেটাই যে অন্য সব পরিচিতিকে ছাপিয়ে উঠবে, তা নাও হতে পারে। নিজের বা অন্যদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে

এই কথাটা— শেষে নয়— গোড়াতেই উপলব্ধি

করা দরকার।

৩

যে সব বিশিষ্টতার মধ্যে দিয়ে বাঙালি পরিচিতি গড়ে উঠতে পারে, তাদের কিছু উপাদানকে আলাদা ভাবে বিবেচনা করা যায়। এগুলোর কোনওটাই অবশ্য এত জোরালো নয় যে আমাদের অন্য পরিচিতিগুলো তার তলায় চাপা পড়ে যাবে। ঐতিহাসিক ভাবে পরস্পর সংযুক্ত এই সব বৈশিষ্ট্য থেকে

কোনও পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না বটে, কিন্তু বাঙালির একটা সাধারণ পরিচিতি নির্ধারণে এদের প্রত্যেকটা নিয়েই চিন্তাভাবনা করাটা ফলবান হতে পারে।

অন্যদের থেকে বাঙালির যে পার্থক্যই থাকুক, তার কারণগুলো কী কী? প্রথমত, যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় এক হাজার বছর ধরে প্রাধান্য বজায় রাখার পর বাকি দেশ থেকে হারিয়ে গেল, বাংলায় তা আরও কয়েক শতাব্দী জোরালো ও প্রভাবশালী থেকেছে। বৌদ্ধ পাল রাজারা চার শতাব্দী ধরে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন, যার অবসান ঘটে দ্বাদশ শতকে। তার পরে এবং ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান শাসনের সূচনার মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়টাতে ছিল হিন্দু রাজত্ব। বাংলা ভাষার উদ্ভবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার-সহ বাঙালি সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্যই বাংলায় বৌদ্ধ রাজত্বকালের শেষ পাদে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সমৃদ্ধি লাভ করে। সাধারণ ভাবে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবটা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার ছিল, তার চরিত্রও ছিল একেবারে আলাদা। বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাসে, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ইতিহাসে এটা খুব স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, বাংলা থেকে জাহাজে যাতায়াতের জলপথগুলো দীর্ঘ দিন আগেই চালু হয়েছিল। চিনা পরিব্রাজক ফাক্সিয়ান (ফা-হিয়েন) ৪০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসার সময় স্থলপথ ব্যবহার করেন; খোটান ও আফগানিস্তান হয়ে এ দেশে আসতে তাঁর সময় লেগেছিল দু'বছর। কিন্তু, দেশে ফেরার সময় তিনি জলপথ ধরেন, তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক) বন্দর থেকে। বাংলা থেকে তিনি শ্রীলঙ্কা ও জাভা হয়ে দেশে ফেরেন। তত দিনে এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত।

কলকাতার কাছেই গঙ্গার মোহনা ছিল বাংলায় উৎপন্ন বহুবিধ পণ্য রফতানির কেন্দ্র। বিশেষত এখানকার সুতিবস্ত্র ইউরোপ-সহ গোটা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে আসা নানান সামগ্রীও এই বন্দর থেকে রফতানির জন্য জাহাজে তোলা হত (যেমন পটনা থেকে আসত শোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট)। বিভিন্ন সওদাগরি প্রতিষ্ঠান যে এখানে আসতে প্রলুব্ধ হয়েছিল, সেটা এই অঞ্চলের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসাবাণিজ্যের আকর্ষণেই। তাদের অন্যতম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যারা শর্বরী পোহালেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করল। বাংলায়, এবং বাংলার মধ্যে দিয়ে, ব্যবসা করার জন্য কেবল ইংরেজরাই নয়, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার এবং অন্য অনেক ইউরোপীয় সওদাগরি কোম্পানিও সেই সময় বাংলা থেকে কারবার চালাচ্ছিল।

নাব্যতার সমস্যার কারণে গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন কঠিনতর ছিল। এ রকম কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যে, গঙ্গার যে মূল স্রোতটা হুগলি হয়ে বর্তমান কলকাতার পাশ দিয়ে বইত, সেটা ক্রমশ পলি জমে ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়ল। জোরালো হয়ে উঠল অন্য ধারাটা, যেটা পূর্ব

দিকে, বর্তমান বাংলাদেশের দিকে গিয়েছিল। রিচার্ড ইটন এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: “পলি জমতে জমতে অনেক আগে থেকেই গঙ্গা তার পুরনো অববাহিকা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে পূর্ব দিকে নতুন নতুন খাতে ছড়িয়ে গেল, এবং ভৈরব, মাথাভাঙা, গরাই-মধুমতী আর আরিয়ালখান হয়ে শেষ পর্যন্ত, ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে, পদ্মার সঙ্গে মিশে গেল। এর মধ্যে দিয়ে গঙ্গার মূল স্রোত সোজা গিয়ে পড়ল পূর্ব বাংলার বুকে।” (দ্য রাইজ় অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, ১২০৪-১৭৬০)। এই পরিবর্তনের প্রভাবে পূর্ববাংলার অর্থব্যবস্থা উপমহাদেশীয় ও বিশ্ব বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, এবং পুবে আর্থিক কর্মকাণ্ডের দ্রুত প্রসার ঘটতে লাগল। এর প্রতিফলন ঘটল পূর্ববাংলা থেকে এমনকি মুঘল কোষাগারেও ক্রমবর্ধমান রাজস্ব সংগ্রহে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে এই অঞ্চলে নবাগত মুসলমানদের তেজীয়ান ভূমিকার সোৎসাহ বর্ণনা পাওয়া যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত এই কাব্যে মুকুন্দরাম লিখছেন, এই অঞ্চলে আর্থিক সমৃদ্ধি আনার পাশাপাশি হিংস্র বাঘেদের তাড়ানোর ব্যাপারেও মুসলমানদের কী ভূমিকা ছিল। সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল থেকে পাই:

পশ্চিমের বেরুনিঞা আইল দফর মিঞা

সঙ্গে জন দুই হাজার

জোড় করি দুই কর জপে পির পেগম্বর

বন কাটী বসায় বাজার।

ভোজন করিয়া জন প্রবেশ করিল বন

সহস্র বেরুনিঞা জন

বন কাটে দিআ গাড়া পাইআ বেরুনিঞার সাড়া

ধায় বাঘা করিআ করুণ।

ঢাকার বিখ্যাত মসলিনের মতো অসামান্য নৈপুণ্যে উৎপাদিত বস্ত্র-সহ অনেক শিল্প-উদ্যোগ গড়ে উঠল। অ্যাডাম স্মিথ বাংলাকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। এই সমৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতা।

আকবরের বিপুল উচ্চাশা সত্ত্বেও, এবং তাঁর রাজদরবারে চালু থাকা সত্ত্বেও, তাঁর প্রস্তাবিত 'তারিখ-ইলাহি' দিল্লি বা আগরাতেও জনমানসে দাগ কাটতে পারল না। কিন্তু সদ্য সদ্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া বাংলায় এর প্রভাব থেকে গেল চিরাচরিত বাংলা পঞ্জিকার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে। নতুন বাংলা সন পুনর্নির্ধারিত হল তারিখ-ইলাহির শূন্য বৎসরটিকে ধরে, কালের হিসেবটাকে ১৪৭৮ শকাব্দ থেকে হিজরি ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পিছিয়ে দিয়ে। তবে হিন্দু শকাব্দের অনুসরণে এটি সৌর পঞ্জিকাই থাকল। ফলে সেই বছর থেকে হিন্দু শক পঞ্জিকা ও খ্রিস্টান গ্রেগরীয় পঞ্জিকার মতোই ৩৬৫ দিনে বছরের বাংলা পঞ্জিকা মুসলমান চান্দ্র পঞ্জিকা হিজরির চেয়ে ধীর গতিতে এগোতে থাকল (হিজরি পঞ্জিকায় বছর হয় ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে)।

তা হলে এই বছরটা— বাংলা সন ১৪২৬— কোন ঘটনার কথা জানাচ্ছে? উত্তর হল: এই বছরটা কার্যত হিজরি পঞ্জিকার সূচনার, অর্থাৎ হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার স্মারক, যা চান্দ্র ও সৌর হিসেবের মিশ্রণে তৈরি একটি গণনা— ৯৬৩ পর্যন্ত মুসলমান চান্দ্র, এবং তার পর থেকে হিন্দু সৌর। ধর্মীয় আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান কোনও হিন্দু যখন বাংলা সন-এর হিসেবে কোনও হিন্দু তিথি পালন করছেন, তখন তিনি এর সঙ্গে হজরত মহম্মদের সংযোগের ব্যাপারটা জানতেও পারেন, আবার না-ও পারেন। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতির এই মিশ্র চরিত্রটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থত, বাংলা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা ভারতের অন্য অনেক ভাষায় পাওয়া যায় না। বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের অবদানই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষত্বের একটি লক্ষণীয় দিক হল বাংলা ভাষায়, বিশেষত ক্রিয়াপদে, লিঙ্গভেদের ব্যবহার না করা। নির্মীয়মাণ বাংলা ভাষা ক্রমশ লিঙ্গভেদের প্রথাগত বৈশিষ্ট্যটাকে বর্জন করে, যে বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত ভাষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্মীয়মাণ বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের— এবং প্রায়শই বিশেষ্যের— রূপগুলোয় স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের ব্যবহার চরিত্রে বরং তুর্কি ভাষার অনুরূপ।

সংস্কৃত থেকে অনেকটা সরে গিয়ে বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদ বর্জনের ব্যাপারটা দেখা যায় মাগধী প্রাকৃত নামে পরিচিত প্রাকৃতের পূর্ব দিকের শাখাটির ক্রমবিকাশের মধ্যে। কথ্য ভাষায় শব্দের লিঙ্গভেদ বর্জিত হল। ক্রিয়াপদেও স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের বিভাজন পরিত্যক্ত হল। লক্ষণীয়, একই রকম রূপান্তর ঘটল মাগধী প্রাকৃত থেকেই আসা ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষার ক্ষেত্রেও। গোড়ার দিকের ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্যে লিঙ্গভেদ না থাকার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের রচনাগুলোতে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই যেমন বাংলা ভাষার বিকাশে পারস্পরিক সহযোগিতা করেছেন তেমনটাই করেছেন অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা, যাঁরা

ভাষায় লিঙ্গের ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, এবং সেটা ঘটেছে বাংলা ভাষার উদ্ভবের বহু আগে।

২৭ অগস্ট ২০১৯ কলকাতায় দেওয়া আইডিএসকে প্রতিষ্ঠা দিবস বক্তৃতার অনুবাদ